Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 12 - 22
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

প্রান্তজন, বিশ্বায়ন এবং সৈকত রক্ষিতের গল্প

ড. দীপঙ্কর মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ, ঝাড়গ্রাম
Email ID : dipankar.mondal7@gmail.com

Received Date 21. 09. 2024
Selection Date 17. 10. 2024

Keyword
Globalization, Saikat Rakshit, Marginalization, Marketization, Edge Bengal, Working people, Life struggle.

Abstract

The Bengali equivalent of the English Globalization is the word 'Bishwayan' used in rap. Many also favor the use of the terms globalization or internationalization as alternatives to globalization. In fact, the full bond of the word Globalization is Economic Globalization. In one word, Globalization ie marketization-spread of global capitalism. Marginalization is an important issue in globalization. Marginalization is a complex process by which a group of people is pushed to the bottom of society, either socially, economically, politically, or culturally. In this essay we have tried to discuss the impact of globalization on the lives of these marginalized people in the short stories of the Bengali short story writer Saikat Rakshit. In the context of the discussion, we have selected his stories 'Ankshi', 'Pagha', 'Maraikal', 'Laxman Sahis', 'Pot', 'Utkhater Patabhumi' etc. But Saikat Rakshit no longer wants to write stories, he wants to convey the history of a social revolution in stories. Want to show the change in that society and at the same time want to show that in the era of globalization where the state is taking so many steps for development, a nation is only becoming more marginalized day by day clinging to some ignorance and superstition. It is very painful for the country and the nation, and that pain was heard in this story. In the name of globalization, global capital is creating a new power structure by uniting people, states, societies and nations, but at the same time, the larger population of the world is not only being economically exploited by the power of capital, but with it, social instability, identity crisis, religious extremism are born. Infinite expansion, displacement of local culture. The world we live in today is without roots or foundations. Due to this challenge to the national culture, the question of what is the identity of man, where are his roots, etc. has become a deep spiritual question today. Not getting any shelter, people are taking refuge in religion. Extremist and militant sects of religion are taking advantage of this weakness. As a result, while the world is uniting in terms of markets and economic activities, people are becoming divided socially and culturally. That is why nationalism and national identity movements are gaining strength. What is the self-identity of man, where are his roots, etc. questions are playing a role in people's life today. Saikat Rakshit is one such seasoned storyteller who has been writing

stories and novels for more than four decades. Since the seventies, the new journey of Bengali fiction has been one of its passengers. A particular political slogan of the seventies was to surround the city with the village. Who knows how successful it was in politics, but village life occupies a wide space in Bengali fiction. Even after various changes, Saikat Rakshit's writing has not been displaced, it is not a small matter.

Discussion

ইংরেজি 'Globalization' -এর বাংলা প্রতিশব্দ রূপে 'বিশ্বায়ন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। অনেকে বিশ্বায়ন শব্দের বিকল্প হিসাবে ভুবনীকরণ বা গোলকায়ন বা আন্তর্জাতিকীকরণ শব্দগুলিও ব্যবহারের পক্ষপাতী। আসলে Globalization শব্দটির সম্পূর্ণ বন্ধনটি হল 'Economic Globalization'. এককথায় 'Globalization' অর্থাৎ বাজারায়ন – বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদের প্রসার। Malcom Waters তাঁর 'Globalization' গ্রন্থে 'Global' শব্দটিকে প্রায় চারশো বছরের পুরাতন বলে মনে করেছেন। গ্লোবালাইজেশন, গ্লোবালাইজড এবং গ্লোবালাইজিং শব্দগুলি ১৯৬০ সালের আগে পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়নি। তাঁর মতে ১৯৬১ সালে 'Webstar' অভিধানে প্রথম গ্লোবালিজম এবং গ্লোবালাইজেশনের সংজ্ঞা দেওয়া হয়। সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে প্রথম বিশ্বায়ন নিয়ে আলোচনা শুরু হয় ১৯৬০ এবং ১৯৭০ এর দশকে। ১৯৬০ সালে Mcluhan সংস্কৃতি ও গণমাধ্যম সম্পর্কীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে 'গ্লোবাল ভিলেজ' (Global Village) ধারণাটিকে নিয়ে আসেন, যার মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন কিভাবে নতুন ধরনের প্রযুক্তিগত যোগাযোগ ব্যবস্থা সমগ্র বিশ্বকে ক্রমশ সংকুচিত করে একটি একক ব্যবস্থাতে পরিণত করেছে। অর্থাৎ বিশ্বায়ন হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ব একটি 'একক বিশ্ব ব্যবস্থাতে' (Single Global System) রূপান্তরিত হয়। Anthony Giddens বিশ্বায়নের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলছেন–

> "Globalization refers to the fact that we all increasingly live in one world, so that individuals, groups and nations become interdependent."[১]

অন্যদিকে Waters বিশ্বায়ন বলতে গিয়ে বলছেন—

> "A social process in which the constraints of geography on social and cultural arrangements recede and in which people become increasingly aware that they are receding."[২]

Roland Robertson 'Global Modernities' - গ্রন্থে John Nederveen Pieterse - এর 'Globalization as hybridization' প্রবন্ধে Albrow-র বক্তব্যকে তুলে ধরেই বলেছেন—

> "Globalization refers to all those processes by which the people of the world are incorporated into a single world society, global society."[৩]

১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে ১৩৫টি দেশ একটা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যচুক্তিতে যোগ দিয়ে গড়ে তোলে World Trade Organization সংক্ষেপে W.T.O, যাকে ক্ষমতা দেওয়া হয় বিশ্বে মুক্ত বাণিজ্যের সুযোগ গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রয়োজনীয় চুক্তি করতে এবং সেই চুক্তিগুলো তদারক করতে। বিশ্বায়নের প্রবক্তাদের মতে, এই ব্যবস্থায় ধনী-গরীব সব দেশই লাভবান হবে, বিদেশী পুঁজি ফলত ধেয়ে যাবে গরীবদেশের দিকে। যে দেশে উৎপাদন খরচ কম সে দেশে স্থানান্তরিত হবে মূলধন ও প্রযুক্তি, ফলে কর্মসংস্থান বাড়বে। বিশ্বায়নের মাধ্যমে মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাবে দ্রুত পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে।

সংস্কৃতি হল সমাজের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য যা অন্যান্য প্রাণীকুল থেকে আমাদের স্বতন্ত্র করে। ব্যক্তির সামনে একটি পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ গড়ে তোলে। পোশাক-পরিচ্ছদ, পারস্পরিক সম্পর্কস্থাপন, খাদ্যাভাস প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যক্তি যথাযথ আচরণ প্রতিপালনে শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে এই সংস্কৃতি সংস্পর্শে। সংস্কৃতির বিভিন্ন আদর্শ, প্রতীক, দৈনন্দিন ক্রিয়া-কলাপ, আচার-অনুষ্ঠান, প্রথা-প্রতিষ্ঠান, উৎসব, শিল্পকলা প্রভৃতির মাধ্যমে আমাদের একটি পৃথক সাংস্কৃতিক পরিচিতি গড়ে ওঠে। কোন একটি স্থানের মানুষজন একটি পৃথক জনসম্প্রদায় গঠন করে, যাদের নিজস্ব একটি সংস্কৃতি থাকে যা 'স্থানীয়

সংস্কৃতি' হিসাবে পরিচিত। সাধারণভাবে স্থানীয় সংস্কৃতির বাসিন্দারা একই ধরনের জ্ঞান বহন করে এবং এদের ভৌত পরিবেশ মূলত স্থায়ী হয় দীর্ঘকালব্যাপী। তাছাড়া তাদের বাসস্থানের সাথে তাদের বিভিন্ন ধরনের আচার-অনুষ্ঠান, প্রতীক বা অতীত অভিজ্ঞতাগুলি এমন ভাবে সংযুক্ত থাকে যে এগুলো ছাড়া তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা ভাবা যায় না এবং এটাই স্থানীয় সংস্কৃতির মূল ভিত্তি। সমাজে বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোষ্ঠিকে পৃথক পৃথক পরিচিতি প্রদান করে এবং এভাবেই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, খাদ্যাভাস, যৌন আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, নান্দনিক পদ্ধতি ক্ষেত্রে বৈচিত্রতা পরিলক্ষিত হয়। এটা সত্য যে প্রত্যেকটি সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের আদান-প্রদান, মিথস্ক্রিয়া, আত্তীকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে সেগুলির ভাষাগত, ধর্মীয়, আঞ্চলিক সীমানাগুলি ক্রমশ বিলীন হয়ে যায়। বলা যায় যে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া আঞ্চলিক সীমানাগুলিকে মুছে ফেলার ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে চলেছে। বিশ্বায়নের ক্ষেত্রে প্রান্তীয়করণ একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। প্রান্তীয়করণ হলো এমন একটি জটিল প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোন গোষ্ঠীর মানুষজনকে সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিকভাবে সমাজের শেষ সীমানাতে বা নিম্ন অবস্থানে ঠেলে দেয়া হয়। এই প্রক্রিয়াটি হল মানুষ দ্বারা তৈরি সামাজিকভাবে নির্মিত একটি প্রক্রিয়া, যা অসম স্তরবিন্যাস কাঠামো তৈরি করে। সাধারণভাবে এই প্রান্তীয় মানুষেরা মূল ধারার সমাজব্যবস্থা থেকে হয় বিচ্ছিন্ন থাকে না হয় আংশিকভাবে সম্পর্কযুক্ত থাকে। সমাজতত্ত্বে প্রান্তীয়করণের ব্যাপারটিকে দেখা হয় সমাজের কোন গোষ্ঠী কোন বিশেষ বিশেষ বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ বা সংহতিপূর্ণভাবে বসবাস করছে কিনা তার পরিপ্রেক্ষিতে, অর্থাৎ সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ক্রিয়াকর্মে তাদের অংশগ্রহণের প্রকৃতি কিরূপ তার উপরেই প্রান্তীয়করণের ধারণাটি নির্ভর করে। যেমন কোন গোষ্ঠী অর্থনৈতিকভাবে সমাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত হলেও সামাজিকভাবে প্রান্তীয় হতে পারে। অর্থাৎ সম্পর্কযুক্ত না থাকা এবং অংশগ্রহণ না করা কিন্তু কোনো গোষ্ঠীকে সমাজে প্রান্তীয় করে তুলতে পারে এবং সর্বোপরি সেই গোষ্ঠী সমাজ থেকে বর্জনের ব্যাপারটি নির্ধারিত হয় সমাজব্যবস্থাতে তাদের ভূমিকার উপর। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, লিঙ্গবৈষম্য, পিতৃতান্ত্রিকতা, প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে প্রান্তীয়করণ প্রক্রিয়াটি বৈধতা লাভ করে এবং সামাজিকীকরণ, শিক্ষা, রাজনীতিকীকরণ প্রভৃতির মাধ্যমে সমাজে প্রান্তীয়করণ প্রক্রিয়ার পুনরুৎপাদন ঘটে চলে দীর্ঘকালব্যাপী। সমাজ কাঠামোতে প্রান্তীয়করণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যায়, যেমন— পেশাগত ক্ষেত্রে, স্তরবিন্যাস ব্যবস্থাতে, আয়ের ক্ষেত্রে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, ক্ষমতা কাঠামোর মধ্যে ইত্যাদি। ভাষা ও অন্যান্য ধর্মের প্রতীকী আচরণ, রাজনীতি, আচার-অনুষ্ঠান, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক প্রান্তীয়করণ পরিলক্ষিত হয়। আবার সামাজিক প্রান্তীয়করণ সেই আনুষ্ঠানিক আন্তঃসম্পর্কগুলির মধ্যে দেখা যায় যেখানে প্রাধান্যকারী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে একটি গোষ্ঠীকে হয় আংশিকভাবে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়, নতুবা সম্পূর্ণভাবে বাধা দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে এই প্রান্তীয় গোষ্ঠীগুলির প্রতি প্রাধান্যকারী গোষ্ঠীগুলি বা মূলধারার সমাজ আচার-আচরণ বা মিথস্ক্রিয়ার ক্ষেত্রে নানা বিধিনিষেধ আরোপ করে। অর্থনৈতিক প্রান্তীয়করণের ফলে এই সকল গোষ্ঠী সমাজের মূল ধারার অর্থনীতির অংশীদার হতে পারে না। ফলে তারা নিম্নমানের নিম্নমজুরির কাজের সাথে যুক্ত থাকে। নিম্ন মজুরের কাজ মরশুমি কাজ বা বেকারত্ব তাদেরকে ক্রমাগত দরিদ্রতার দিকে ঠেলে দেয়। এই অর্থনৈতিক দুরবস্থা তাদের জীবনযাত্রার মানকে এমন নামিয়ে দেয় যে মূল ধারার সমাজব্যবস্থা থেকে তারা ক্রমশ প্রান্তে চলে যায়, রাজনৈতিকভাবে প্রান্তীয় গোষ্ঠীগুলোকে আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা কাঠামো এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সম অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকতে হয়। ফলে তারা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী গোষ্ঠীর অধঃপতন বলে প্রতিপন্ন হয় এবং অনেকাংশে তাদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন তাদের মধ্যে ঘটে না সমাজের প্রাধান্য কারী গোষ্ঠীর দমন-পীড়ন ও হেজিমনি তাদের সহ্য করতে হয়। আর প্রাধান্যকারি গোষ্ঠী তাদের হেজিমনিকে বজায় রাখার জন্য প্রান্তীয়তাকে পুনরুৎপাদন করে চলে। যাই হোক, বিশ্বায়নের সুদূরপ্রসারী ফলাফল নিয়ে উক্তি-প্রত্যুক্তি চলতেই থাকবে। তবে একথা ঠিক, বিশ্বায়ন একদিনের ফসল নয়। এটা সমাজের একটা চিরকালীন রূপ, আর সমাজের সঙ্গে সাহিত্যও যেহেতু অঙ্গাগি সম্পর্কে যুক্ত সেহেতু সাহিত্যের আঙিনাও বিশ্বায়নমুক্ত নয়। বাংলা সাহিত্য সম্পর্কেও এই কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের একটি অন্যতম শাখা হল ছোটগল্প, যার রূপবৈশিষ্ট্য নির্মাণ করতে গিয়ে 'যন্ত্রণার ফসল' এমন আখ্যায় বিশেষিত করা হয়েছে। সময়োচিত অবস্থার সার্থক রূপায়ণ ছোটগল্পের ভুবনে সর্বাধিক ক্রিয়াশীল।

বিশ শতকের বিশ্বায়নের অভিঘাত যে ভুবনকে সর্বাধিক আলোড়িত করেছে এবং যে আলোড়নে ক্রমে ক্রমে মানব-মন যান্ত্রিকতায় পর্যবসিত হচ্ছে, নষ্ট হচ্ছে মূল্যবোধ, অবক্ষয়িত হচ্ছে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিভূমি। বোধ হয়, এমনভাবে বলা যেতে পারে এখন বর্তমানে যার পিছনে তেমন কোনো অতীত নেই, রয়েছে বিশ্বায়নের অনিবার্য অভিঘাত। আপাদমস্তক যাপনকৌশলের বদল অত্যন্ত বেশি করেই এ কথাকে প্রতিষ্ঠা করতে চায় যেন, এ বদল জীবনধারনের এবং জীবন সম্পর্কে ধারণারও। মূলত বিশ শতকের আটের দশক কিংবা তার কিছুটা আগে থেকেই অর্থনীতির ওঠা পড়া মানুষকে বুঝিয়ে দিয়েছিল গুরুত্ব শুধু বাজারি অস্তিত্বের। স্যাটেলাইট, ইলেকট্রনিক্স ও অন্যান্য মিডিয়ার দৌরাত্ম্যে জীবন-যাপন বদলে যাচ্ছিল দ্রুত। সুতরাং যে জীবনে অভিযোজিত হয়ে যেতে আমরাও দৌড় শুরু করেছিলাম। সে দ্রুততায় ঢাকা পড়েছে আমাদের সযত্ন রক্ষিত আদর্শ, মূল্যবোধ ইত্যাদি। ভোগবাদী পণ্যমনস্কতা আমাদের বিকিকিনির সামগ্রীতে পরিণত করেছে। বিশ্বায়নের তীব্র অভিঘাতে বর্তমান সমাজজীবন যখন পরিবর্তিত মূল্যবোধের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন, একবিংশ শতকের বাংলা ছোটগল্পকারদের হাতে যে জীবনের মানোদর্পণে আমরা আমাদের প্রতিবিম্ব দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি, সেই গতানুগতিক প্রথাবদ্ধতার জটাজাল ভেদ করে বাংলা ছোটগল্পের একটা অন্যধারা যেন পেয়ে গেলাম সৈকত রক্ষিতের কলমে। সৈকত রক্ষিতের গল্পে উঠে আসে এমন এক রাঢ়বঙ্গীয় প্রেক্ষাপট, যেখানে চরিত্রদের মুখগুলি, ঘুরে যায় ভারতীয়তার দিকে, বিশ্বায়নের দিকে। গল্পে গুরুত্ব পায় আখ্যানের প্রতিবেশ। ফলে উন্মোচিত হয় শুধু গদ্যের নয়, ভাবনার এবং জীবনেরও হয়তো-বা সাবঅলটার্ন এক বিকল্প। আসলে, সৈকত রক্ষিতের গল্প ভাঙচুর এই সময়ের টানাপোড়েন আর গলনমুহূর্তকে ছুঁয়ে যায় এক অনন্ত দ্রাঘিমায়। প্রচলিত গল্প রচনার ধারার বিপরীত মেথডকেই তিনি 'স্টাইল অফ রাইটিং' করেছেন। গল্পের প্রচলিত ফর্মাট ভেঙে মানুষ এবং পরিবেশকে গুরুত্ব দিয়ে সৈকত রক্ষিত তাঁর গল্পে তুলে ধরেন মানুষের অর্থনৈতিক জীবনকে, যে জীবন একজন মানুষকে তার নির্দিষ্ট অবস্থান জানিয়ে দেয়। তিনি বলছেন–

> "শ্রেণি অবস্থান থেকেই মানুষের মধ্যে আসে শ্রেণি সচেতনতা। আসে শ্রেণি বিদ্রোহও। আমার বিভিন্ন গল্পে জীবন প্রান্তিকতায় পৌঁছে যায়, বিদ্রোহে সম্ভাবনা উত্তরোত্তর গড়ে ওঠে।"[৪]

তবে তিনি 'ঘটিয়ে দেওয়া' বা 'দেখিয়ে দেওয়া' বিদ্রোহের লেখক নন। তিনি আত্মিকভাবেই চেয়েছেন মানবজাতির পরিবর্তন এবং যে পরিবর্তন আসতে পারে মানুষের আত্মপ্রক্রিয়ায়। কিন্তু ক্রমাগত পুঁজির আগ্রাসন, বিশ্বায়ন এবং রাজনীতি বিত্তহীন মানুষের জীবনে কিভাবে অভিশাপ হয়ে দেখা দিচ্ছে- পুরুলিয়ার প্রান্তবঙ্গীয় জীবনকে প্রেক্ষাপট করে সৈকত রক্ষিত অধিকাংশ গল্পে এই ভাবনাকে রূপ দিতে প্রয়াসী হয়েছেন। শুধুমাত্র গল্পের জন্য যে গল্প তা তিনি কখনোই লেখেননি, সামাজিক ইতিহাসের দিক থেকে তাঁর গল্প বিশেষ মূল্য দাবি করে। আর সে দাবি আরও জোড়ালো হয়ে ওঠে লেখক যখন নিজেই জানান—

> "আমি লিখি মূলত 'সাবঅলটার্ন'দের নিয়ে। মফস্বল শহর, গ্রাম এবং গ্রামজীবন আমার লেখার উপজীব্য। এবং সেটা পুরুলিয়ার। আদিবাসী অধ্যুষিত পুরুলিয়ার এক প্রত্যন্ত গ্রামে আমার জন্ম। আমার পূর্বপুরুষদেরও আদিভূমি এই পুরুলিয়া। গত কুড়ি বছর ধরে জেলার সাঁওতাল-আদিবাসী ছাড়াও বিভিন্ন জনগোষ্ঠী নিয়ে গল্প-উপন্যাস লিখেছি। আমার পেশাহীন ভ্রাম্যমাণ দিনযাপনের সূত্রে গ্রামের এইসব মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে মনে হয়েছে, আমাদের মতো দেশে একজন দরিদ্র মানুষই বোধ হয় জীবনের ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যকে অনেকবেশি উপলব্ধি করতে পারে। দারিদ্র্যই জীবনের সঙ্গে যোগ করে জীবনের বহুমাত্রিকতা। আমার লেখায় এই বহুমাত্রিকতার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিতে চাই।"[৫]

গল্পকারের এই সকল মন্তব্যের যথার্থতা বিচার করতে গেলে আমাদের প্রবেশ করতে হবে তাঁর গল্পভাণ্ডারে।

'আঁকশি' গল্পে সৈকত রক্ষিত তুলে ধরলেন আধুনিক বিশ্বায়নগ্রাসে তলিয়ে যেতে বসা জুয়ালকাঠি গ্রামের মগারাম মুচি আর তার পরিবারকে। আত্মীয়কুটুম্বহীন মগারামের পরিবারে আছে তার বৃদ্ধা মা, বউ বেদেনি, দুই পুত্র লীলকমল এবং নুনু। নামকরণ থেকেই বোঝা যায় নামের বিলাসিতা এদের নেই, আসলে যেখানে অন্নচিন্তা চমৎকারা সেখানে এই বিলাসিতা বাহুল্যমাত্র। যাই হোক, শিমুল গাছ থেকে ফল সংগ্রহ করে তা থেকে তুলো বের করে তারা বাজারে বিক্রি করে দিনাতিপাত

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 03
Website: https://tirj.org.in, Page No. 12 - 22
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

করতো। আসলে যে আদিবাসী মানুষজনকে তাদের শিল্প, কলাভাবনা, উন্নত লোকসংগীত সত্ত্বেও আমরা হীনচোখে দেখি — মাগারাম মুচিরা যেন তাদের তুলনাতেও অনেক বেশি অনুন্নত— 'চৌকো করে তোলা মাটির পাতলা দেয়াল'-এ ঘেরা 'খোঁটা পুঁতে ঢালু করে বসিয়ে দেওয়া... চালার ঠাট'-এ 'মহুল গাছে'র মাথায় 'চালার খড়'- এর ওপর 'সাউড়ি ঘাস'- এ ঢাকা আস্তানায় তারা থাকে। নিজেদের সম্পর্কগুলো যেমন অনাদরে-অযত্নে জোড়া, ঠিক তেমনি মানের চিহড় লতা দিয়ে বাঁধা তাদের কাঠপোঁতা বাড়িঘর। যার না আছে ছিরি, না আবরুর ছাঁদ, না নিরাপত্তা। বিপদেরও আসা বারণ, কারণ তাকে আটকানোর জন্য প্রয়োজনীয় দরোজাটুকুও নেই মুচিরামের; আছে শুধু দুর্দিনের 'ভরমার'। ভুট্টা সেদ্ধ করে ল্যাটো ক'রে খেয়েও কাঁহাতক বাঁচতে পারে পাঁচ-পাঁচটি পরাণ? মাটি কেটে, পাথর ভেঙে, অন্যের ক্ষেতে লাঙ্গল ঠেলেও যখন হয় না কিছুই, তখন মানবাজারের শেঠেদের কাছে টাকা ধার ক'রে তারা বেরিয়ে পড়ে শিমূলের সন্ধানে। কিন্তু লোভী মানুষের অনিয়ন্ত্রিত চাহিদার ফলে রাতারাতি জঙ্গল থেকে শিমুল গাছ সাফ হয়ে যেতে লাগলো।

> "দিনকে দিন কাঠের দামে আগুন লাগছে। জঙ্গলও সাফ হয়ে যাচ্ছে রাতারাতি। দরকারি ও মূল্যবান গাছগুলো লরি বোঝাই হয়ে চলে যাচ্ছে শহরের দিকে। টাটা-চাণ্ডিল-পুরুলিয়া।"[৬]

মাগারাম হাতে আঁকশি আর পিছনে পরিবারকে নিয়ে গ্রামান্তরে খুঁজে চলল শিমুলগাছ। এমনকি ছোট্ট লীলকমলও বাবাকে সঙ্গ দেয়, কারণ "ফলন্ত শিমুলের গাছ বাপকে দেখিয়ে দিতে পারলে, লীলকমল জানে, বাপ তার খুশি হয়। কাঁধের লম্বা আঁকশিটা ধীরে ধীরে আসমানের দিকে তুলে ধরে।"[৭] কাঁধের লম্বা আঁকশিটা আসমানের দিকে তুলে ধরার ইঙ্গিতের মাধ্যমে গল্পকার যেন বলতে চাইলেন কাঙ্খিতকে পেতে হাতের নাগালটাই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন একটা আঁকশির, যা মগারামের মত মানুষদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে পারে। নিজের পরিবার প্রতিপালনের জন্য মগারাম গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে বেড়ায়, সন্ধান করে শিমুলগাছের। এমন গ্রাম সে খুঁজে বেড়ায় যেখানে তার আগে কোন শিমুলওয়ালা পৌঁছায়নি। আসলে এটাও যেন একরকমের বিশ্বায়ন – বাজার ধরার। বিশ্ববাজারে যে দেশ যত দ্রুত পৌঁছাতে পারে তার পণ্যের ডালি নিয়ে, সেই দেশ তত দ্রুত মুনাফা করতে পারে। দরিদ্র মগারামও যেন তার পেটের তাগিদে বিশ্বায়নের সেই ইঁদুর দৌড়ে সামিল। অবশেষে মগারাম তার কাঙ্খিত বস্তুর সন্ধান পায় রঞ্জনডি গ্রামের ভকু গরাইয়ের বাড়িতে। ভকু অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। তার ঘরে গরু, বাছুর, ধান-চালের বস্তার লাট, নিকানো বড় উঠোন, গাছ ভর্তি পেঁপে। কিন্তু 'গরাইয়ের খাবার গরজ নেই। মগারামের মনে হল, কত সহজেই সে আঁকশির একটা হ্যাঁচকা টানে এগুলো নামিয়ে নিতে পারে। পারে, কিন্তু মগারাম পারে না। জগতের নিয়ম এমন। একদল প্রাচুর্য নিয়ে নিশ্চিন্তে থাকে, আবার মগারামের মতো আরেক দল শুধু অসহায় দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে আনচান করতে থাকে'।[৮] গল্পকার বলছেন–

> "একজন অবস্থাপন্ন স্বচ্ছল মানুষের পাশাপাশি এক অভুক্ত ক্ষুধার্ত মানুষের চিত্র বড়োই করুণ।"[৯]

ভকুর তিনটে শিমুলগাছ চল্লিশ টাকায় চুক্তি করে মগারাম গাছ ঝাড়ার কাজ শুরু করে। মগারামের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে ভকু তার কাছে জানতে চায়- 'এখন শিমৈল্ তুলাটা কত করে বিকাছে?'[১০] উত্তরে সে জানায়- 'কত আর? এই ধ'র লেন ক্যানে – এখন ত চৈত মাসের কুড়ি দিন হঁয়ে গেল? এখন মানবাজারের দকানিরা আমাদের এই কাঁচা মালটা কিনবেক আধুলি কম তিন টাকায়। আর শুকাশুকি করে সেটা বিকবেক তেরো টাকায়'।[১১] তারপর থাকে ধূর্ত ব্যবসায়ীদের জোচ্চুরী। ওজন কম করে দেখানো। মগারামের এই কথা থেকে আমরা বুঝতে পারি তাদের মত লোকের এই কঠিন পরিশ্রমে বাস্তবে কারা লাভবান হয়! বিশ্বায়নের সূচনায় বিশ্ববাজারে সমস্ত মানুষের জন্য যে লাভের কথা বলা হয়েছিল আদতে তা চলে গেল বিশেষ কিছু মানুষের হাতে, আর ভুক্তভোগী হল মগারামেরা। সারাটা গল্পে এভাবেই যেন একটা সাদা ক্যানভাসে সরু-মোটা দাগের ছবির রঙ ও রেখার ছাপ, মাগারামদের জীবনের কোনো উত্থানও নেই, পতনও— শুধু জুয়ালকাঠিতে ঘূর্ণন, আর ঘূর্ণনে আটকে পড়ে এই প্রান্তবাসীরা। তাদের শরীরে ফুটে ওঠে কেবল বিশ্বায়নের বিষাক্ত দাগ।

'পাঘা' গল্পে সৈকত রক্ষিত বললেন কাড়িয়র গ্রামের শামাউন আনসারির কথা। ঝালদার হাটে সে বেচতে যায় তার একমাত্র দুধেল গাই ও তার বাছুর, কারণ 'গেল জষ্টি মাসের গর্মিতে তার হালের গোরুটা যখন জঙ্গলের বিষাক্ত পাতপালা খেয়ে মুখে ফেনা তুলে আর পাতলা পায়খানা করে মরে গেল...'।[১২] ফলে ঘরে তার হাল জোতার একটাই গরু,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 03
Website: https://tirj.org.in, Page No. 12 - 22
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আর এরই জোড় কেনার টাকা জোগাড় করতে শামাউনের গাই বিক্রি করতে আসা। এদিকে লাঙল ভাড়া করে চাষ করার সামর্থ্য তার নেই। ঝালদার হাটে তাই সে এসেছে একটু বেশি দামে বাছুর সহ গাই গরুটা বিক্রি করতে। কিন্তু হাটে সে যখন কোন কূল-কিনারা করতে পারছে না, তখন দেখা হয় ইউসুফের সঙ্গে। ইউসুফ এসব ব্যাপারে তথাকথিত মিডল ম্যান। 'গবাদি পশু কেনাবেচায় সে ওস্তাদ। কারবারে নিজের পুঁজি খাটায় না। ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝখানের মানুষ সে। দু-তরফের সংযোগ ঘটিয়ে দু-পক্ষের ইনাম খায়'।[১৩] এই ইউসুফের পাল্লায় পড়ে শেষ পর্যন্ত ৩২৫ টাকায় গাই-বাছুর বিক্রি করতে বাধ্য হয়। শামাউন উপলব্ধি করে 'এই টাকায় সে কার কাছে গোরু কিনবে? দু-দাঁতের একটা ছোটখাটো গরু? নাকি জোয়ালের অন্যপাশে ব্যাটা আবুদনকে জুড়ে সে খেতে লাঙল ঘুরিয়ে যাবে'?[১৪] শামাউনের এই ভাবনা আমাদের চমকে দেয়। আসলে বিশ্বায়ন পর্বে আমরা দেখেছি যা কিছু মুনাফাখোর মধ্যসত্ত্বভোগীদের, যারা ব্যক্তিস্বার্থের সুবিধার্থে হতদরিদ্র মানুষকে শোষণ করতেও পিছপা হয় না, এই গল্পে ইউসুফ এদেরই প্রতিনিধি। অন্যদিকে শামাউনের মত লোকেরা প্রতি মুহূর্তে ঠকে যায়, দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়, তবু এদের জন্য আমাদের সমাজের কিছু যায় আসে না। এদের স্বপ্ন নেই, এদের কল্পনা নেই, এদের শিশুদের খিদে পেটেই মরে যায়, এদের কাছে ভাতের গন্ধ আর গোবরের গন্ধ, ছাগলের লোমের গন্ধ এক হয়ে যায়। পেটে শুধু জ্বলে অনন্ত ক্ষুধা। অবশেষে সেটাও মরে যায়। তার প্রিয় গবাদি বিক্রি হয়ে যায় ঠিকই, থেকে যায় শুধুই পাঘা – যা পশুর গলা থেকে স্থানান্তরিত হয় মানুষের গলায়।

'মাড়াইকল' গল্পে পাই চেপুলাল বেশরাকে, যার বিদ্রোহী হওয়ার কোন লক্ষণ নেই। তার সমস্ত শরীর জুড়ে কেবল অদৃশ্য শিকলের চিহ্ন, যা নিয়ে সে দিব্যি আছে। 'কিন্তু পাঠক তাকে দেখে স্বস্তিতে থাকতে পারে না। সে যখন তার জীর্ণদেহে বাঁশপাতার মতো বেরিয়ে থাকা পাঁজরাগুলো দেখিয়ে তার মনিবকেই প্রশ্ন করে, হ্যাঁ কুঞ্জাখুড়া, হামি আর কৎদিন বাঁচব? বাঁচব হামি?' - তখন সে যেন তার ক্ষয়িষ্ণু বিশ্বস্ত অস্তিত্ব ও নিঃস্বতার গৌরব নিয়ে এই কৃষিপ্রধান উপমহাদেশের ক্ষেতমজুর তথা সমাজের আদর্শ প্রতিনিধি হয়ে দাঁড়ায়। নিজেকে যেভাবে সে আখখেতের মালিকের কাছে তার সপরিবার বন্ধক দিয়ে জীবনকে আজকের দিনেও এক সামন্ততান্ত্রিক ধাঁচায় পড়ে তার সর্বসময় মুনিশ হয়ে ক্রীতদাসত্বের জীবন অতিবাহিত করছে, সেই জীবনের অপচয় দিয়েই সে পাঠক-মনে বিপরীত এফেক্ট সৃষ্টি করছে। চেপুলাল তার মনিবের খেতে আখ চাষ করছে, আখ কাটাই করছে, সেই আখ নিংরে পানা বার করছে, সেই পানা থেকে গুড় করছে। এই সবই সে করছে তার মনিবের জন্যে। তারপরও শীতের রাতে আখশাল পাহারায় থাকতে থাকতে ঠান্ডায় কুণ্ডলী পাকিয়ে চট জড়িয়ে মরে পড়ে থাকে চেপুলাল। তার গা থেকে শেষ গুড়টুকুও যখন কুকুর চেটে নেয়, তখন সমগ্র পরিস্থিতিই যেন চেপুলালের হয়ে রিভোল্ট করে'।[১৫] 'মাড়াইকল' গল্প যাঁর কলমে আমরা এই গল্প সম্পর্কে তাঁরই বিশ্লেষণ পেলাম। আসলে চেপুলালেরা কখনো কুঞ্জ হতে পারে না। প্রকৃত আখচাষির মতোই খেতের মালিক কুঞ্জ বছর বছর চাষের সফলতাটুকু নেয়, আর ভাকি ভয়টুকু যায় চেপুলালের কাছে। সে গাড়ির গাড়োয়ান, আর গাড়ির পিছনে থাকে মালিক; অর্থাৎ চেপুলাল হল ঢাল, যে ঢালের আড়ালে কুঞ্জর মত সুবিধাবাদীরা চিরকাল নিজেদের অক্ষত রাখে। কুঞ্জ জানে, নিজের জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে চেপুলাল সপরিবারে তার সেবা করবে। তাই চেপুলাল যখন কুঞ্জর কাছে নিজের মৃত্যুর ক্ষণ জানতে চায়, তখন চমকে উঠে কুঞ্জ ভাবে 'হঠাৎ করে মরে গেলে কে দেখবে কুঞ্জর আখের চাষ? শালের আগুনের সামনে ঠায় বসে থেকে, প্রহরের পর প্রহর ফুটন্ত রসের কড়াইয়ের গাদ কেটে, টিন টিন আখের রসকে কে রূপান্তরিত করবে ঝোলা গুড়ে, রজ গুড়ে, বালি গুড়ে'?[১৬] আসলে কুঞ্জ ব্যবসা-নগদ-পুঁজি এসব যতটা ভালো বোঝে ততটা কম বোঝে মানুষের মনকে। কিন্তু চেপুলালের মত প্রান্তজনেরা এত স্বার্থপর নয়। মালিকের কাছে তীব্র ভৎসনা, লাঞ্ছনা পেয়েও নিজের দায়বদ্ধতাকে কখনো ভুলে যায় না। কঠিন শীতে একটা চাদরও তার মালিকের কাছ থেকে জোটে না, বরং একটা ছেঁড়া কাঁথা কোথাও থেকে জুটিয়ে নিয়ে সে তার শীত নিবারণ করে। আসলে বিশ্বায়ন পর্বে আমরা দেখেছি সময় যত এগিয়েছে মানুষের মূল্যবোধ ততটাই কমে গেছে, দূষিত হয়েছে তার চরিত্র। কুঞ্জর মত বিত্তশীল মানুষের চোখও তাই সহজেই চলে গেলে চেপুলালের স্ত্রী ভাবনির আদুল স্তনের দিকে। অথচ প্রান্তজনেরা তাদের জীবিন দিয়েও রক্ষা করে মনিবের সম্পত্তি- "চেপুলাল, তার আখের ছিবড়ের মতো নির্ভার শরীরটা দিয়ে আগলে রাখতে চায় পানায় টুইটম্বুর কড়াইটি। সে রাখেও। মাদলার পাশে জমে থাকা আখের ছিবড়ে, যা আবার আলাদা করে শুকানো হয়েছে, তা-ই সে উনুনে ঠেলে দেয়। সেই

জ্বালানির লেলিহান আগুন, চেপুলালের বুকের পাকা-পাকা লোমগুলো অব্দি ধুঁড়সে নিতে চায়। বুকের লোমগুলো, বগলের গোড়ায় ময়লা জমা পুরু লোমগুলো, তার শরীরের ঘাম আর বোঁচকা গন্ধ নিয়ে তেমনি থেকে গেলেও, কব্জির ওপর থেকে হাতের এমনকি পায়ের কিছু কিছু লোমও ঝলসে গেছে আঁচে।'[১৭] কিন্তু কোনো দিকেই ভ্রূক্ষেপ থাকে না চেপুলালের। গল্পকার বলেছেন গায়ের লোম, মাথার চুল, আঙুলের নখ – সবই যেন তার শরীরের পটভূমিতে নিতান্তই প্রাচুর্য। অর্থাৎ যে মানুষ নিজের শরীর তুচ্ছ করে মালিকের জন্য এভাবে প্রাণপাত করে তার পেটভরে খাবারও জোটে না।

> "কুঞ্জ এখনো শালে আসেনি দেখে, যতটা পারে গুড় খেয়ে নিচ্ছে হীরালাল। ভাবনিও। পলাশ পাতায় অনেকটা করে ঘন গুড় এখন তাদের প্রাতরাশ। শালঘরের চালার পেছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেতে থাকে তারা। এই খেয়ে কাজ করতে করতে দুপুরে ফের বাসি ভাত শাগ রাঁধা, যা জামবাটিতে কাপড় জড়িয়ে শালঘরে এনে রেখেছে ভাবনি। তারা গুড় চাটে আর একেকবার উঁকি মেরে কুঞ্জর আসার পথটি লক্ষ করে।"[১৮]

আর শীতের প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় মালিকের কাছে একটা কম্বল চেয়েও তাকে খালি হাতে ফিরতে হয়, জোটে কেবল একটা চটের বিছানা। এভাবেই হীরালাল ব্যক্তি থেকে জাতিতে পরিণত হয়। আসলে একটা মানুষ যেন একটা জাতিরই প্রতিনিধিত্ব করে। তাই ব্যক্তি হীরালাল আমাদের অজান্তেই 'সাঁওতাল' হয়ে ওঠে। আর হীরালালের মাধ্যমেই প্রকাশ পায় প্রান্তীয় আদিম অধিবাসীদের প্রতি ধনিক শ্রেণীর বঞ্চনা। বিশ্বায়নে যে বিশ্বগ্রামের কথা বলা হয়েছিল, যে গ্রামের রূপ বাস্তবায়িত হলে সকলে সমমর্যাদা পেতে পারতো, উৎপাদিত ফসলে সকলের থাকতো সমান অধিকার – তা কিন্তু অধরাই থেকে গেল। শুধু হাড় হিম শীতের রাতে মালিকের ফসল পাহারা দিতে গিয়ে প্রাণ দিল চেপুলাল। মৃত চেপুলালের পা চাটতে থাকা কুকুরটাও শেষ পর্যন্ত কুঞ্জর দিকে যে ছাই উড়িয়ে দেয়, আসলে তা যেন আমাদেরই সমাজের ভস্মাবশেষ।

'আট বছর আগের একদিন' কবিতায় জীবনানন্দ বলছেন, 'যে জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের- মানুষের সাথে তার হয়নাকো দেখা', কিন্তু কবিতার বাস্তবতা আর জীবনের প্রবহমানতা কখনোই যেন এক হতে পারে না। তাই লক্ষ্মণ সহিসকে জীবন চালাতে ছাগলের নাদি-পেচ্ছাপের মধ্যেই শুয়ে পড়তে হয়।

> "ছাগল-ভেঁড়ির গু-মুত, মুরগির খোঁয়াড়, আর জায়গায়-জায়গায় ডাঁই করে রাখা মোষের শিং ...মোষের পচা শিং যখন ক্রমশ শুকিয়ে আসে, তার তীব্র গন্ধ তাদের নাকে এতখানিই পরিচিত ও সহনীয় যে, আঘ্রাণ পেলে তারা চনমনে হয়। কেন না, সেই ঝুনো শিং করাত দিয়ে কেটে, বাঁশ্‌লা দিয়ে কুঁদে – বহুত বহুত কিসিমের হাতিয়ারের কারিগরি প্রয়োগে তারা পায় একটা ঝকঝকে চিরুনি।"[১৯]

চিরুনি ঝকঝকে হলেও সহিসদের জীবন সজনে গাছে পুঞ্জীভূত শুঁয়োপোকার মতো একাকীত্বে ভরা। নিজেদের নিয়ে নিয়ে বিব্রত হয়ে ওঠা এই মানুষগুলো সারাদিন টিলার ওপর থেকে ফ্যাকাশে চোখে চেয়ে থাকে দিগন্তের দিকে – অতিথিবেশী খরিদ্দারের জন্য। এদের চাহিদা খুব অল্প। দু'টাকাই এদের জীবনে অনেক। কিন্তু লুধাকে 'সেরেফ' দু'টাকাও দেবার ক্ষমতাও নেই লক্ষ্মণের। ঘরে চাল নেই লুধার, তাই বউকে চিড়া ভাজা কিনে খেতে দেবে। এদিকে সহিসরাও বুঝতে পারে চিরুনির কুটির শিল্পকে বাঁচিয়ে পেট চালানো সম্ভব নয়। পাথুরে জমিতে চাষবাসও কম। মহাজনের কাছে ঋণের দায়স্বরূপ সে জমিও তাদের হাতছাড়া হচ্ছে।

> "তাদের দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে শহুরে ঝানু কারবারিরা এখন সে-সব জায়গা জলের দরে কিনে তাদেরকে আরও উৎখাতের পথে ঠেলে দিয়েছে। শুধু ল্যাদামহুল না, পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন গ্রামে ব্যবসায়ীরা এইভাবে নিজেদের প্রসার ঘটাচ্ছে। গঙ্গাদাস মোহতার শহরে চলছে কাপড়ের ব্যবসা। আবার কুড়ুকতুপা গ্রামে সেখানকারই জনা দশ লোক খাটিয়ে সে নিজস্ব সেচের ব্যবস্থা করে চালাচ্ছে অ্যাগ্রিকালচারাল ফার্ম। ল্যাদামহুলে দাঁড়িয়ে পূর্ব-পশ্চিমে যে সবুজ খেত ভরা ধান হাওয়ায় টালমাটাল হতে দেখা যায়, তার মালিকানা কোনো সহিসের না। ইয়াসিন কিংবা বাসন বিক্রেতা গুণারাম মণ্ডলের।"[২০]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 03
Website: https://tirj.org.in, Page No. 12 - 22
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

চিরুনির কাজে সুবিধে না করতে পেরে সহিসরা ভিন্ন পথ ধরছে। পেটের তাগিদে কেউ কেউ যেমন শহরে যাচ্ছে, তেমনি কেউ নিজের বৃত্তির পরিবর্তন করে গ্রামে গ্রামে ঘুরে লটারি বিক্রি করছে। বিশ্বায়ন পর্বে এই এক নেশা মানুষের সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে। রাতারাতি অর্থবান হবার নেশায় মানুষ পাগল। সরকারি বুজরুকি বা বঞ্চনা কোনটাই তাদের চোখে পড়ে না। গ্রামগুলো ধীরে ধীরে শহুরে প্রবণতায় আক্রান্ত হচ্ছে। শান্ত-স্নিগ্ধ গ্রামজীবনে আধুনিকতার ব্যাপ্তি ঘটছে। বদলে যাচ্ছে গ্রামের মানুষের মানসিকতা। বিশ্বায়নের ফলে গ্রাম্য জীবনের এই পরিবর্তন গ্রামের কুটির শিল্পকেও গ্রাস করছে। সময়ের সঙ্গে কঠিন সংগ্রামে মানুষ এভাবেই বিপন্ন হয়ে নিজের জীবিকা পরিবর্তন করে নিতে পিছপা হয় না। মানুষের এই জীবিকা পরিবর্তনে ধ্বংস হয় গ্রামীন অর্থনীতি যা বিশ্বায়নের একটা বড় কুফল। লক্ষ্মণ কিন্তু জাত শিল্পী-

> "ছোলা শিংটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে বাৎসল্যের দৃষ্টিতে দেখে আর বলে, 'শিংয়ের কাম যদি অচল হঁয়েও যায়– হাতদুটা আছে কী নাই? করে-কম্মে খাবই।'"[২১]

তাই বয়সের দোষে চোখে চালশা পড়লেও করাত থেমে যায়নি লক্ষ্মণের। কিন্তু দুর্ভিক্ষের কাছে সব পরাজিত হল। পাইকার আসা বন্ধ হয়ে গেল ল্যাদামহুলে। মানুষের চোখে শুধুই বিষণ্ণতা। মানুষ গ্রাম ছাড়ে। একসময় গ্রাম প্রায় জনশূন্য হয়ে যায়। যে জেদ নিয়ে এতদিন লক্ষ্মণ গ্রামে পড়েছিল, অবশেষে তাতেও ভাঙন ধরে। ছেঁড়া কাঁথা গায়ে জড়িয়ে কোদাল হাতে তাকেও পাড়ি দিতে শহরে অনির্দেশের উদ্দেশ্যে। এতে বিশ্বরাজনীতির উদ্দেশ্য হয়তো সিদ্ধ হল, কিন্তু একটা গ্রামীন সংস্কৃতি মিশে গেল কালের গহ্বরে।

সৈকত রক্ষিত নিজেই আখ্যানকথক, আখ্যানবিশ্লেষক ও ব্যবচ্ছেদক। তিনি জীবনের গভীরে প্রবেশ করে জীবনের সমস্যাকে বাস্তবরূপ দেন। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাই তাঁর কথাভুবনের মূল বিষয়। প্রান্তীয় গুহিরাম চিত্তকরের জীবন সংগ্রাম নিয়ে গড়ে উঠেছে 'পট' গল্পটি। তার পূর্বজরা ঘরে ঘরে পট বানাত, ছবি আঁকত, কিন্তু সে দিন অস্তমিত হয়েছে। তবে এখনও তারা পটকার নামেই পরিচিত। আসলে নিজেদের ঐতিহ্যকে তারা হারাতে চায় না। এখন সে দিন নেই তবুও ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরেই বাঁচতে চায়। দারিদ্র্য ও অনটনে পড়ে প্রাচীন শৈল্পিক নৈপুণ্যকেও হারিয়েছে। তবু এখনও তারা 'পাইট্‌কার'। গুহিরামের এখন কাজ মৃত্যুবাড়িতে গিয়ে পরলৌকিক ক্রিয়া সম্পর্কে নানা বিশ্বাসের কথা শোনানো, ফলে কিছু চাল সহ অর্থ জোটে। তবে শিক্ষিত পরিবারে সে প্রবেশ করে না, কেননা সেখানে কেউ এসব বিশ্বাস করে না। এজন্য গুহিরামকে খবর রাখতে হয় কোন বাড়িতে মৃত্যু ঘটেছে এবং সেই সঙ্গে সংগ্রহ করে সেই পরিবারের যাবতীয় তথ্য। এ কাজের জন্য তাকে ছুটতে হয় এই গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে। গ্রীষ্মের ভরা দুপুরে খালি পায়ে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সৈকত রক্ষিতের বেশিরভাগ নায়কই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে না, তাদের অভিযোগ প্রকৃতির বিরুদ্ধে। আসলে পুরুলিয়ার রুক্ষ প্রকৃতিতে তারা বিদ্ধস্ত। তেমনি জীবনের প্রতি কোন আসক্তি নেই গুহিরামের, তাঁর সুসংবাদ আসে মৃত্যুতে –'ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংবাদ শুনতেও সে আগ্রহী নয়। তার যত আগ্রহ মরা মানুষের খবর জানার'।[২২] আসলে সৈকত রক্ষিত একটি সময়-সমাজের কথা বলতে চান। সেই সমাজের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তিনি সভ্যতার বিবর্তন দেখিয়ে দেন। আর সে বিবর্তন চিহ্নিত হয় পুরুলিয়ার ভূগোলকে কেন্দ্র করেই। মুসলিম বাদ দিয়ে ছত্রিশ ঘর জাতির ঘরে মৃত্যুর পর উপস্থিত হয় সে, সামান্য রোজগারের আশায়। তাঁর স্ত্রী চেপি সহ দুই সন্তান নিয়ে অভাবের সংসার। তবে এঁরা কেউ নিয়তির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেনি। তেমনি গুহিরাম উদাসীন সন্তানদের প্রতি। সে জানে এই রুক্ষ মাটিতে বাঁচতে হলে প্রথম থেকেই সংগ্রাম করতে হবে। লেখকের দৃষ্টি গুহিরাম সহ এই পটকর সমাজের প্রতি। সেই বৃত্তি কীভাবে হারিয়ে আজ অন্য বৃত্তিতে প্রবেশ করেছে পটকর সমাজ এবং সেখানে জীবনের যে বিবর্তন তাই তিনি দেখতে চান ও পাঠককে দেখাতে চান। এই পটকরদের স্ত্রী বছরের বিভিন্ন সময় জমিতে কাজ করে, মৃত্যুর খবর তারাই বহন করে আনে। গুহিরাম মৃত্যুর দ্রুত, মৃত্যুতেই তাঁর আনন্দ, তবে বাড়িতে ফিরে সে সন্তানের পিতা। লেখক সে জটিলতা অদ্ভুত সুন্দর ভাবে দেখান –

> "এখন গুহিরাম আর পাইট্‌কর নয়। সে অন্য মানুষ। সে সন্তানের পিতা। তার ভেতরেও সন্তানদের প্রতি মমতা আছে। পিতৃত্ব আছে। শত কষ্ট ও দারিদ্র্যের মধ্যেও সে চায় তার সন্তাদের দীর্ঘায়ু আর সতত হাসিমুখ।"[২৩]

সমাজের পরিবর্তন গুহিরামের চোখে পড়ে, আসলে লেখকই তা পাঠককে দেখিয়ে দিতে চান। সমাজে শিক্ষার প্রসার ঘটলেই তাদের এই কর্মের অবসান ঘটবে তা সে জানে, ফলে গোষ্ঠীবদ্ধতাকে টিকিয়ে রাখতে চায়। আজ গুহিরাম এক মৃত বাড়িতে উপস্থিত হয়েছে, নানা ছল ছুতোয় নানা জিনিস নিয়েছে, যাবার সময় অন্য এক বাড়িতে প্রবেশ করে। কিন্তু সে বাড়িতে তখনও মানুষ মৃত হয়নি। কিন্তু পাইট্‌কার আসা মানেই অশুভের ইঙ্গিত, ফলে সবাই প্রহার শুরু করে গুহিরামকে। প্রথমে সে বাঁচার চেষ্টা করে, নিজের অর্জিত চাল রক্ষার চেষ্টা করে কিন্তু কিছুই রক্ষা করতে পারে না, শুধু ভেসে ওঠে অভুক্ত সন্তানের মুখ –

> "প্রহৃত হতে হতেও চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকে তার অভুক্ত সন্তানদের মুখগুলি। সে দেখতে পায়, তালগুড়গুড়ি কোলে নিয়ে উঠোনে পড়ে রয়েছে তার ছোট ছেলে। আধখানা পাঁউরুটি নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে দু-ভাই। ...ভাবতেই ভিড় ঠেলে নিজেকে বের করে আনে গুহিরাম। কিন্তু ছুটে পালিয়ে যেতে পারে না। পাথরে হোঁচট খেয়ে দণ্ডী দেওয়ার ভঙ্গিতে পড়ে যায়! চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে গাঁটা-বাঁধা চাল। গড়িয়ে যায় থালাটিও। তার কোমর থেকে খসে পড়া কাগজগুলো বাতাসে উড়ে যায়।"[২৪]

'লক্ষ্মণ সহিসে'র মত এই গল্পও আসলে একটা গ্রামীন সংস্কৃতির মৃত্যু; বিশ্বায়নের প্রখর গ্রাসে এভাবেই হারিয়ে যায় আরও এক প্রান্তজন।

সৈকত রক্ষিত তাঁর বিভিন্ন গল্পে আদিবাসী জীবনসংগ্রামকে বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। একুশ শতকের বুকে দাঁড়িয়ে আমাদের দেশের আদিবাসীদের অবস্থা কেমন বা কী ধরণের পরিবর্তন তাদের জীবনে ঘটেছে অর্থাৎ এককথায় এই জনজাতি কীভাবে কোন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে সমাজের বুকে উঠে দাঁড়াতে চাইছে, তাদের জীবন সংগ্রামের কথাই লেখক তাঁর একাধিক গল্প-উপন্যাসে তুলে ধরতে চেয়েছেন। 'উৎখাতের পটভূমি' এমনই সংগ্রামের গল্প, ভারতবর্ষ নামক দেশের চলমান ইতিহাসের গল্প। যে ভারতবর্ষ আবহমান কাল ধরে পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে, সেখানেও যে নানা উদ্বাস্তু আছে তাদের গল্প। আদিবাসী সমাজের যে বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি তা লেখক চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। সৈকত রক্ষিত গল্পে জনজীবনের চালচিত্রের আভাস দিতে চান। তাঁর কাছে গল্পে আখ্যানের চেয়ে পরিবেশ বেশি গুরুত্ব পায়। পুরুলিয়া জেলার যে রুক্ষ প্রকৃতি তাই তিনি অঙ্কন করতে চান। সেই রুক্ষ প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যে রুক্ষতা, জীবনে বেঁচে থাকার যে অসহায়তা তা তিনি অঙ্কন করেন চিত্রকরের তুলিতে। 'উৎখাতের পটভূমি' এক আদিবাসী পুরুষ ও রমণীর ভূমিচ্যুত হওয়ার গল্প। চাকা নদীর তীরে কুটনি গ্রামে বসবাস সেমতি বেসরার। সে সন্তানহীন, স্বামীও কিছুদিন আগে মারা গেছে। আদিবাসী সমাজে সে চিহ্নিত হয়েছে ডাইনি হিসেবে। সমাজের অত্যাচার থেকে রক্ষা পেতে সে বনে আশ্রয় নিয়েছিল। তাঁকে ভালোবাসে মড়েয়া নামে এক যুবক। প্রথমে সেমতির সন্দেহ হলেও পরে মড়েয়ার ভালোবার প্রতি বিশ্বাস জন্মে। তারা পালিয়ে গিয়ে নতুন করে ঘর বাধতে চেয়েছিল কিন্তু আবার ধরা পড়ে যায়। বিচারে অর্থ জরিমানা হয়, সিমতির সঙ্গে যোগাযোগের জন্য মড়েয়ারও অর্থ জরিমানা হয়। তবে শুধু অর্থই জরিমানা নয়, মড়েয়া সিমতিকে বিবাহ করে এই গ্রামে থাকতে পারবে না তাও জানিয়ে দেয় গ্রাম প্রধানরা। জরিমানায় প্রাপ্ত অর্থ দেবার জন্য কিছুদিন সময় দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই জমি বাড়ি সমস্ত ফেলে সেমতি ও মড়েয়া অন্য ভূখণ্ডে চলে যায়। লেখক ঘোষণা করেন–

> "এক আদিম ভূখণ্ড ছেড়ে আরও এক ভূখণ্ডের সন্ধানে।"[২৫]

গল্পের কাহিনি এটুকুই। কিন্তু সৈকত রক্ষিত তো আর কাহিনি লিখতে চান না, তিনি গল্পে একটি সমাজ বিপ্লবের ইতিহাস ধরে দিতে চান। সেই সমাজের পরিবর্তনকে দেখিয়ে দিতে চান এবং একইসঙ্গে এটাও দেখাতে চান বিশ্বায়ন পর্বে যেখানে রাষ্ট্র আর উন্নতির জন্য এত পদক্ষেপ নিচ্ছে, সেখানে একটা জনজাতি কেবল দিনে দিনে আরও প্রান্তীয় হয়ে পড়ছে কিছু অজ্ঞানতা আর কুসংস্কারকে আঁকড়ে থেকে। দেশ এবং জাতির পক্ষে এটা অত্যন্ত যন্ত্রণার, আর সেই যন্ত্রণার কথাই এই গল্পে শোনা গেল।

বিশ্বায়নের নামে মানুষ, রাষ্ট্র, সমাজ ও জাতিকে একীভূত করে বিশ্ব পুঁজি নতুন নতুন ক্ষমতাকাঠামোর জন্ম দিচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে পুঁজির ক্ষমতাবলয়ে পৃথিবীর বৃহত্তর জনগোষ্ঠী কেবল অর্থনৈতিকভাবে শোষিত হচ্ছে তা-ই নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে জন্ম নিচ্ছে সামাজিক অস্থিরতা, আত্মপরিচয়ের সংকট, ধর্মীয় উগ্রপন্থার অসীম বিস্তার, স্থানীয় সংস্কৃতির উচ্ছেদ। যে বিশ্বে আজ আমরা বাস করি, সেটি শিকড় বা ভিতবিহীন। জাতীয় সংস্কৃতির সামনে এই চ্যালেঞ্জের কারণে মানুষের আত্মপরিচয় কী, তার শিকড় কোথায় ইত্যাদি প্রশ্ন আজ গভীর আধ্যাত্মিক প্রশ্নে পরিণত হয়েছে। কোনো আশ্রয় না পেয়ে মানুষ ধর্মের আশ্রয় নিচ্ছে। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ধর্মের অতি উগ্র এবং জঙ্গি ধারার আবির্ভাব ঘটছে। ফলে বাজার এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের দিক থেকে পৃথিবী যদিও ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে মানুষ হচ্ছে বিভক্ত। সে কারণে জাতীয়তাবাদ এবং জাতীয় আত্মপরিচয় আন্দোলন শক্তিশালী হচ্ছে। মানুষের আত্মপরিচয় কী, তার শিকড় কোথায় ইত্যাদি প্রশ্ন আজ মানুষের জীবনে ভূমিকা রাখছে অনেক বেশি। স্থানীয় সমাজ বৈশ্বিক প্রভাবকে তার সংস্কৃতিতে ব্যবহার করার কারণে মিশ্রণ ঘটছে সংস্কৃতির। তাতে করে সংকট আরও গভীর হচ্ছে। সৈকত রক্ষিত এমনই এক কালপর্বের গল্পকার, যিনি চার দশকেরও বেশি গল্প-উপন্যাস লিখছেন। সত্তরের দশক থেকে বাংলা কথাসাহিত্যের যে নবযাত্রা তার অন্যতম যাত্রী সৈকত রক্ষিত। সত্তর দশকের বিশেষ একটি রাজনৈতিক স্লোগান ছিল গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরে ফেলা। তা রাজনীতিতে কতখানি সফল হয়েছিল কে জানে, কিন্তু বাংলা কথাসাহিত্যে গ্রামজীবন বিস্তৃত জায়গা দখল করে। নানান পরিবর্তনের পরেও সৈকত রক্ষিতের লেখা এখনও স্বজন-স্বভূমিচ্যুত হয়নি, এও কম কথা নয়। প্রত্যক্ষ বাস্তব অভিজ্ঞতাই এই গল্পগুলির ভিত্তিভূমি, কেননা এত নিবিড় ডিটেলিং বাস্তব অভিজ্ঞতা ছাড়া সম্ভব নয়। এ যেন লেখকের এক আনন্দ ভুবন, সে ভুবনের অংশীদার করতে চান পাঠককে। এ বিষয় আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে লেখকের বক্তব্যে—

> “আমি সারা বছরই পাহাড়ে-জঙ্গলে, নদীর চরে চরে, শবর-সাঁওতাল-বাউরি-কুর্মীদের গ্রামে, আদিবাসী মেলায়, বাউল-ঝুমুর-খেমটি নাচের আসরে ঘুরে বেড়াই। আসলে ভ্রমণের ভেতর দিয়ে যে বিচিত্র ভূখণ্ড ও মানবসমাজের সন্ধান আমি পাচ্ছি আমার লেখার মধ্যে সেটাই- সেই জীবনের আনন্দ-উল্লাস-দুঃখ-বিষাদ উজ্জীবনের প্রতিরূপ পাঠকের কাছে উপস্থাপিত করতে চেষ্টা করি অখণ্ড প্রেক্ষাপটসহ। আমার কাছে তাই একটা গল্প মানে জার্নিও...।”[২৬]

আর এভাবেই ভুবনায়নের যন্ত্রণাকে বুকে আঁকড়ে নিয়েই সৈকত রক্ষিতের গল্পের প্রান্তজনেরা এগিয়ে চলে অন্য এক ভুবনের সন্ধানে।

Reference:

১. Giddens, Anthony (2006) : Sociology, 5th edition; Polity Press; UK. P. 50
২. Water, Malcom (1995) : Globalization, Routledge, Londan and New York. P. 3
৩. Robertson, Roland (1995): Globalization: Time Space and Homogeneity-heterogeneity in Featherstone Mike, Lash, Scott and Robertson Roland (edt). Global Modernities; Sage, Londan. P. 44
৪. রক্ষিত, সৈকত, উত্তরকথা, পারুল, ২০১৫, কোলকাতা, পৃ. ৮
৫. রক্ষিত সৈকত, কেন লিখি, সুভাষ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), মিত্র ও ঘোষ, পৃ. ২৭৮
৬. রক্ষিত সৈকত, আঁকশি, উত্তরকথা, পারুল, ২০১৫, কোলকাতা, পৃ. ১২
৭. রক্ষিত সৈকত, আঁকশি, উত্তরকথা, পারুল, ২০১৫, কোলকাতা, আঁকশি, পৃ. ১২
৮. রক্ষিত সৈকত, আঁকশি, উত্তরকথা, পারুল, ২০১৫, কোলকাতা, আঁকশি, পৃ. ১৬-১৭
৯. রক্ষিত সৈকত, আঁকশি, উত্তরকথা, পারুল, ২০১৫, কোলকাতা, আঁকশি, পৃ. ১৭
১০.রক্ষিত সৈকত, আঁকশি, উত্তরকথা, পারুল, ২০১৫, কোলকাতা, আঁকশি, পৃ. ১৯
১১. রক্ষিত সৈকত, আঁকশি, উত্তরকথা, পারুল, ২০১৫, কোলকাতা, আঁকশি, পৃ. ১৯
১২. রক্ষিত সৈকত, পাঘা, উত্তরকথা, পারুল, ২০১৫, কোলকাতা, পৃ. ২৮

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 03
Website: https://tirj.org.in, Page No. 12 - 22
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১৩. রক্ষিত সৈকত, পাঘা, উত্তরকথা, পারুল, ২০১৫, কোলকাতা, পৃ. ২৫
১৪. রক্ষিত সৈকত, পাঘা, উত্তরকথা, পারুল, ২০১৫, কোলকাতা, পৃ. ৩৪
১৫. রক্ষিত সৈকত, উত্তরকথা, পারুল, ২০১৫, কোলকাতা, পৃ. ৮
১৬. রক্ষিত সৈকত, মাড়াইকল. উত্তরকথা, পারুল, ২০১৫, কোলকাতা, পৃ. ৩৮
১৭. রক্ষিত সৈকত, মাড়াইকল. উত্তরকথা, পারুল, ২০১৫, কোলকাতা, পৃ. ৪৬-৪৭
১৮. রক্ষিত সৈকত, মাড়াইকল. উত্তরকথা, পারুল, ২০১৫, কোলকাতা, পৃ. ৪৮
১৯. রক্ষিত সৈকত, লক্ষ্মণ সহিস. উত্তরকথা, পারুল, ২০১৫, কোলকাতা, পৃ. ৫৩
২০. রক্ষিত সৈকত. লক্ষ্মণ সহিস, উত্তরকথা, পারুল, ২০১৫. কোলকাতা, পৃ. ৫৮
২১. রক্ষিত সৈকত. লক্ষ্মণ সহিস, উত্তরকথা, পারুল, ২০১৫. কোলকাতা, পৃ. ৬২
২২. রক্ষিত সৈকত, পট, উত্তরকথা, পারুল, ২০১৫. কোলকাতা, পৃ. ৮৬
২৩. রক্ষিত সৈকত, পট, উত্তরকথা, পারুল, ২০১৫, কোলকাতা, পৃ. ৯৩
২৪. রক্ষিত সৈকত, পট, উত্তরকথা, পারুল, ২০১৫, কোলকাতা, পৃ. ১০০
২৫. রক্ষিত সৈকত, উৎখাতের পটভূমি, উত্তরকথা, পারুল, ২০১৫, কোলকাতা, পৃ. ২৬৯
২৬. রক্ষিত সৈকত, দশটি গল্প, পরশ পাথর, ১৪১৬, কোলকাতা, ভূমিকা।